

বিলাসী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই। আমি একা নই—দশ বারো জন। যাহাদেরই বাটা পল্লীগামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশি জনকে এমনি করিয়া বিদ্যালভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার-ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়—চার-ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, চের বেশি—বর্ষার দিনে মাথার উপর মেঘের জল ও পায়ের নীচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদার বদলে ধুলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগা বালকদের মা-সরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি মুখ লুকাইবেন ভাবিয়া পান না।

তার পরে এই কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান—তাদের চার-ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা যাদের ক্ষুধার জ্বালা তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকেই বা কি সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন। তাঁরা বাস করিতে থাকিলে ত পল্লীর এত দুর্দশা হয় না।

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক্। কিন্তু ঐ চার ক্রোশ-হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই। তার পরে একদিন ছেলেপুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাঁদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না। কিন্তু থাক্ এসকল বাজে কথা। ইস্কুলে যাই—দুক্রোশের মধ্যে এখন আরও ত দু-তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন্ বনে বঁইচি ফল অপরিপাক ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁটাল এই পাকিল বলিয়া কার মর্তমান রস্তার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুর-পাড়ের খেজুর-মেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প—এই সব খবর লইতেই সময় যায়; কিন্তু আসল যা বিদ্যা—কামস্কটকার রাজধানীর নাম কি এবং সাইবিরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে—এসকল দরকারী তথ্য অবগত হইবার ফুরসৎই মেলে না।

কাজেই একজামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি, পারস্যের বন্দর, আর হুমায়ূনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগ্লোক খাঁ—এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় এক রকমই আছে—তার পরে প্রমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাষ্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্তব্য।

আমাদের গ্রামে একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে স্কুলের পথে দেখা হইত। তার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে যে সে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না—সম্ভবতঃ তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়—আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন

দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁটালের বাগান আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়ো-বাড়ি; আর ছিল এক জগতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা—সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কত কি। তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়—উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রান্না করিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আমবাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত এবং ভালো করিয়াই চলিত। যেদিন দেখা হইয়াছে সেইদিনই দেখিয়াছি, ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কাহারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই—বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়—কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে, ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা ত দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে এ কথাও কোন ভদ্র-সমাজে কবুল করিতে চাহিত না—গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল, সে মর-মর। আর এক দিন শোনা গেল, মালপাড়ার এক বুড়া মাল তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ-যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেক দিন তাহার অনেক মিষ্টানের সদ্ব্যয় করিয়াছি—মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়-বাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তাপোষের উপর পরিষ্কার ধপ্পে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিকই যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই সে কেবল ওই মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না; কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, যাই হোক, খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই—ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত—হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনতে পারিয়া বলিল, কে, ন্যাড়া?

বলিলাম, হুঁ!

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, বসো।

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটা কথায় যাহা কহিল তাহার মর্ম এই যে, প্রায় দেড়মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনের দিন সে অজ্ঞান অচেতন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল, এই কয়েক দিন হইল সে লোক চিনতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক, কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা নাই, সেই রোগীকে এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কত বড় গুরুভার! দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রূষা, কত ধৈর্য, কত রাত-জাগা! সে কত বড় সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি আর একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এইবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি? বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মত বোধ হইতেছিল, পথ দেখা ত দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পোঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না ত? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না ত! সুতরাং মনে যাই থাক প্রত্যুত্তরে শুধু একটা কথা না বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, ঘন জঙ্গলের পথ, একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনের পথটা পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না—সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতে বোধ করি তাহার শেষ পর্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম নয়! এই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয়

পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন। মৃত্যুঞ্জয় ত যে-কোন মুহূর্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এই বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কি করিত! কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত!

এই প্রসঙ্গে অনেক দিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি—বাটীতে ছেলে-পুলে চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সদ্য-বিধবা স্ত্রী আর আমি। তাঁর স্ত্রী ত শোকের আবেগে দাপাদাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাঁহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি? তাঁর যে তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নেই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষণ্ড? আর এই রাতেই গ্রামের পাঁচজনে যদি নদীর তীরের কোন একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের জোগাড় করিয়া দেয় ত পুলিশের লোক জানিবে কি করিয়া? এমনি কত কি।

কিন্তু আমার ত আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলে না। পাড়ায় খবর দেওয়া চাই—অনেক জিনিস জোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাইরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, ভাই, যা হবার সে ত হয়েছে, আর বাইরে গিয়ে কি হবে। রাতটা কাটুক না।

বলিলাম, অনেক কাজ, না গেলেও যে নয়।

তিনি বলিলেন, হোক কাজ, তুমি বসো।

বলিলাম, বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হবে, বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না।

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ তখন বুঝিলাম, যে-স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি পাঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছিলেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি বা সহ্যে, তাঁর মৃতদেহটা এই অন্ধকার রাতে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না! বুক যদি কিছুতেই ফাটে ত সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাঁহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে, কিম্বা তাহা খাঁটি নয় একথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে, কিম্বা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শুধু কর্তব্যজ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর-করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোন মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর-করার পরেও হয়ত তাহার কোন সন্ধান পায় না।

কিন্তু সহসা সেই শক্তির পরিচয় যখন কোন নর-নারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়া আবশ্যিক যদি হয় ত হোক, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নয়, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপন অশ্রু বিসর্জন না করিয়া কোনমতে থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস-দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লীগ্রাম দেখেন নাই কিম্বা ওই রেলগাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা! এ কি কখনও সম্ভব হইতে পারে যে, অতবড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই! তাঁহার অবগতির জন্য বলা আবশ্যিক যে, এ শুধু সম্ভব নয়, এই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াসুদ্ধ ঝাঁক ঝাঁপিয়া উপড় হইয়া পড়ে, এই যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামে ছিল কি না, কিন্তু একালে ত কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই তখন সে যে ঝাঁপিয়া আছে এ ঠিক।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে যে, গেল গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না—অকালকুস্মাণ্ডটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে। গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে ত বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়। কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ এ কথা শুনিলে যে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে-বুড়ো সকলের মুখেই ঐ এক কথা। অ্যাঁ—এ হইল কি! কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল!

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাসা দেখিতেছিলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে মরে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো! তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই এখন দেখুক সবাই। কিন্তু আর ত চুপ করিয়া থাকা যায় না! এ যে মিত্তির-বংশের নাম ডুবিয়া যায়! গ্রামের যে মুখ পোড়ে।

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম তাহা মনে করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্তিরবংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারো জন সঙ্গে চলিলাম গ্রামের বদন দক্ষ না হয় এইজন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো-বাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দার একধারে রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠি-সোঁটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের উপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট্ করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোন খুড়া কোনকালে বোধ করি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনি যে, মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না; চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমার বাবুর সাথে নিকে দিয়েছে জানো!

খুড়া বলিলেন, তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি—এবং সঙ্গে সঙ্গেও দশ-বারো জন বীরদর্পে হুক্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটো—এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না, তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ, সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে অত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলাজ্জা হইবে। এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি, নাকি বিলাত প্রভৃতি শ্লেচ্ছ-দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতেই নাই। এ আবার একটা কি কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না! আমরা বলি, যাহারই গায়ে জোর নাই তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পায়া যায়—তা সে নর-নারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তার পরে একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে—রোগা-মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মত মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি; কেননা আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম; কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই—বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভালো কাজ করিতেছি, সেও কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার কথা যাক্।

আপনারা মনে করিবেন না, পল্লীগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক্ হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিত, তাহা হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা—এ ত একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা। কিন্তু

কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া। হোক না সে আড়াই মাসের রুগী, হোক না সে শয্যাশায়ী! কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁটার মাংস নয়—ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ! সে ত আর সত্য-সত্যই মাপ করা যায় না! তা নইলে, পল্লীগ্রামের লোক সঙ্কীর্ণচিত্ত নয়। চার-ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যা যে সব ছেলের পেটে তারাই ত একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়! দেবী বীণাপাণির বরে সঙ্কীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কি করিয়া।

এই ত ইহারাই কিছুদিন পরে প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর-দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, অর্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয় এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা করিয়া অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে। যাই হোক, ছোটবাবু তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্যে গ্রামের বারোয়ারী পূজা-বাবদ দুই শত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা উত্তম ফলাহারের পর প্রত্যেক সদব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কি পথে আসিতে অনেকেই দেশের এবং দেশের কল্যাণের নিমিত্ত কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যাঁরা বড়লোক তাঁদের বাড়িতে বাড়িতে মাসে মাসে এমন সব সদনুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন?

কিন্তু যাক্। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে—যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেক দিন ঘুরিয়া গৌরব করিবার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বলো, ধর্মেই বলো, সমাজেই বলো, আর বিদ্যাতেই বলো,—শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কসিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলেই দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসরখানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি; একদিন দুপুরবেলা ক্রোশ-দুই দূরের মালপাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি একটা কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তার মাথায় গেরুয়া-রঙের পাগড়ী, বড় বড় দাড়ি-চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা—কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়! কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গেছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ-পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেঘরানী বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদব্রাহ্মণের ছেলেকে এন্ট্রান্স পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি; এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চরায়। ভালো ভালো কায়স্থসন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি; আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে—তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোনকালে সে কসাই ভিন্ন আর কিছু ছিল। কিন্তু সকলেরই ওই একটা হেতু। আমার তাই ত মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে, তাহারা কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে

পারে না? যে পল্লীগ্রামে পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নীচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অন্যদের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক্। বোঁকের মাথায় হয়ত বা অনধিকার চর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুষ্কিল হইয়াছে এই যে, আমি কোনমতেই ভুলিতে পারি না, দেশের নব্বই জন নর-নারীই ঐ পল্লীগ্রামেরই মানুষ এবং সেইজন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই। যাক্। বসিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়! কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুশি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, তুমি না আগললে সে রাত্রিরে আমাকে তারা মেরেই ফেলত। আমার জন্যে কত মারই না জানি তুমি খেয়েছিলে।

কথায় কথায় শুনিলাম, পরদিনই তাহারা এখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশঃ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে একথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনিলাম, আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ-ধরার বায়না আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও এমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের উপর আমার প্রবল সখ ছিল। এক ছিল গোখরো কেউটে সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিবে তাহা কে ভাবিতে পারিত!

কিন্তু শক্ত কাজ এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাসখানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ্ না করিতে মৃত্যুঞ্জয় পথ পাইল না। সাপ-ধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল এবং কজিতে ওষুধ-সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে—

ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন—

মনসাদেবী আমার মা—

ওলট-পালট পাতাল ফোঁড়—

টোড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ টোড়ারে দে

—দুধরাজ, মণিরাজ!

কার আঙে-বিষহরির আঙে!

ইহার মানে যে কি, তাহা আমি জানি না। কারণ, যিনি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন-নিশ্চয়ই কেহ না কেহ ছিলেন-তঁার সাক্ষাৎ কখনো পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য-মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল ততদিন সাপ-ধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, এতটুকু বয়সের মধ্যে এত বড় ওস্তাদ হইয়া অহঙ্কারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না, এমনি জো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুই জন। আমার গুরু যে, সে ত ভালো-মন্দ কোন কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এসব ভয়ঙ্কর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়া-চাড়া কোরো। বস্তুতঃ বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলো এমনি অবহেলার সহিত করিতে গুরু করিয়াছিলাম যে, সে-সব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথাটা হইতেছে এই যে, সাপ ধরাও কঠিন নয় এবং ধরা সাপ দুই-চারি দিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক, কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়ীদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রী করা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পলাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার-কয়েক ছাঁকা দিতে হয়। তারপরে তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক আর একটা কাঠিই দেখান হোক, সে যে কোথায় পলাইবে ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখ, এমনি করিয়া মানুষ ঠকাইও না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে-এতে দোষ কি?

বিলাসী বলিত, করুক গে সবাই। আমাদের ত খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছিমিছি লোক ঠকাইতে যাই।

আর একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি, সাপ-ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানা প্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত-আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে ত একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার ত এক রকম নেশার মত দাঁড়াইয়াছিল। নানা প্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথায় ছিল, এ আমাদের মনে স্থান পাইত না। কিন্তু এই পাপের দণ্ড আমাদের একদিন ভালো করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়ি সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে ঘরের মেজে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে-সে হেঁট হইয়া কয়েক টুকরো কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয়, এক জোড়া তো আছে বটেই, হয়ত বা বেশিও থাকতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে, একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখছ না বাসা করেছিল!

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ ত হুঁদুরেও আনতে পারে?

বিলাসী কহিল, দুই-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই আমি বলছি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল এবং মর্মান্তিকভাবেই সেদিন ফলিল। মিনিট-দশেকের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে বাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ করিয়া ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্টা পিঠ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা সবাই যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম! কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পলাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত হইতে এক হাত মুখ বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার মাত্র দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি ত ছিলই, তাহার উপরে আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার উর্ধে আর উঠিবে না। এবং আমার সেই “বিষ-হরির আঞ্জের” মন্ত্রটা সতেজে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং এ-অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকেও সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র-পড়ার আর বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পনের-কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটির উপরে একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম, আমার বিষহরির দোহাই বুঝি-বা আর খাটে না।

নিকটবর্তী আরও দুই-চারি জন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন এবং আমরা কখনো বা একসঙ্গে, কখনো আলাদা তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল, ভালো কথায় হইবে না, তখন তিন-চার জন রোজা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে, মৃত্যুঞ্জয় ত মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধ ঘণ্টা ধ্বস্তা-ধ্বস্তির পরে রোগী তাহার বাপ-মায়ের দেওয়া

মৃত্যুঞ্জয় নাম, তাহার শ্বশুরের দেওয়া মন্ত্রৌষধি, সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাক্ষ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক্, তাহার দুঃখের কাহিনীটা আর বাড়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাত দিনের বেশি আর বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর, আমার মাথার দিব্যি রইল, এ-সব তুমি আর কখনো করো না।

আমার মাদুলি-কবজ ত মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নয় এবং সাপের বিষ যে বাঙালীর বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে ত বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয়ই নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক্, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে তখন ওইরূপ কোন একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এইমাত্র বলিতে পারি!

খুড়ামশাই ষোল-আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মত চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত মৃত্যু হবে ত হবে কার? পুরুষমানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে ত তেমন আসে যায় না-না হয় একটু নিন্দাই হতো। কিন্তু হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে মলো, আমার পর্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভূজি-উচ্চুণ্ড। গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি! অন্ন পাপ? বাপরে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে!

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটাও অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায়ই ভাবি, এ অপরাধ হয়ত উহারা উভয়েই করিয়াছিল; কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ত পল্লীগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই ত মানুষ! তবু এতবড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা, সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নর-নারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশের নর-নারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব পরাজয়ের ব্যথা কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ কিছুই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্বপ্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ-ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক contract—তা সে যতই কেন না বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ন-পাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাহারা পরিহাস করিয়াছিলেন তাহারা সাধু গৃহস্থ, এবং সাধ্বী

গৃহিণী-অক্ষয় সতী-লোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি। কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয়্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই; মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এই বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি ভূদেববাবুর ‘পারিবারিক প্রবন্ধে’র দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথ্য সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও, মুখের উপর কড়া জবাব দিয়া যঁাহারা বলিলেন, এই হিন্দু-সমাজ তাহার নির্ভুল বিধি-ব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলো বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি; প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকা চরম সার্থকতা নয়-এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মত দিবারাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত দু-এক পা হাঁটিতে দিলেও প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥